ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 585-591
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.248

সাংখ্যদর্শনে কল্যাণতত্ত্ব

দিব্যা চৌধুরী, *গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 10.01.2026; Accepted: 13.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Wellbeing refers to a state or condition where an individual can reside in his or her own life in a happy, content, satisfied, and joyful manner. In general terms, this state of happiness or contentment depends on a healthy and joyful environment from all physical, mental, emotional, social, economic, and environmental conditions within each individual's life. While well-being typically denotes mental peace and contentment, it is also important to understand that mental wellbeing or peace cannot be achieved independently from physical or external social conditions, as our mental and physical well-being plays a significant role in responding to all these matters. The Samkhya Philosophy affirms that suffering is perpetuated by the quality of passion and is perpetual in nature; therefore, it cannot be destroyed. However, the experience of suffering is indeed possible and will lead to a transformation into suffering. The attainment of this supreme knowledge will aid in achieving an eternal state of joy and peaceful wellbeing, where suffering will no longer be the cause of unhappiness or ill-being, and individuals will always be situated in the desired state of eternal joy and peaceful wellbeing.

Keywords: Suffering, Peace, Eternal joy, Supreme knowledge, Wellbeing

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় দর্শনের গুরুত্ব সর্বদাই অপরিসীম। ভারতীয় দর্শনের দার্শনিক চিন্তাভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক হল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ জগতে কল্যাণ স্থাপনের মূলমন্ত্র। এই মূল্যবোধ প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত যা অদৃশ্যভাবে চালনা করে তার জীবনশৈলীর গতিপ্রকৃতি। কারণ জাগতিক দুঃখ হতে মুক্ত হতে গেলে ও প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ সাধন করতে হলে অর্থাৎ ভালো থাকতে হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার নিজের জীবনে জীবনশৈলীর সঠিক রূপে বিন্যাস করা প্রয়োজন। যেখানে সে নিজে ও তার সাথে সাথে সকলে দুঃখহীনভাবে সুস্থ ও আনন্দে বিরাজ করতে পারে। যা ধীরে ধীরে কল্যাণ সাধনের পথকে প্রশস্ত করে। কল্যাণ যা সাধারন অর্থে ভালো থাকা বলতে বোঝায় এমন একটি স্থিতি বা অবস্থা যেখানে মানুষ তার নিজের জীবনে নিজে সুখী, সন্তুষ্ট, তৃপ্ত ও আনন্দময় ভাবে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। সাধারণ অর্থে এই সুখ বা সন্তোষজনক অবস্থাটি নির্ভর করে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নিজস্ব জীবনের শারীরিক, মানসিক, আবেগময়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এই সকল দিক থেকে একটি সুস্থ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় পরিবেশে বিদ্যমান থাকার মধ্যে দিয়ে। প্রধানত মানসিকভাবে শান্তি ও সন্তোষপূর্ণভাবে থাকাকে কল্যাণময় বা সুখ অর্থে বুঝলেও মানসিক সুস্থতা বা শান্তি কখনোই শরীর ও

বাহ্য সামাজিক পরিবেশের অবস্থাকে বাদ দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয়। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই সকল বিষয়ের প্রতিক্রিয়া আমাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার পক্ষে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। জগতে প্রতিটি জীবই সদা কল্যাণকামী। সেকারণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হোক না কেন প্রতিটি জীবই তার নিজের জীবনে কিভাবে কল্যাণ বা মঙ্গল সাধিত হবে সে বিষয়ে সদা উদ্যত থাকে, কিন্তু এই জগতে শুধুমাত্র নিজে ভালো থাকা বা নিজের জীবনে কল্যাণ সাধনের চিন্তাভাবনা কখনোই প্রকৃত অর্থে সার্বিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হয় না। কারণ জগতে প্রতিটি জীব তার পারিপার্শ্বিক সমস্ত জীবজগৎ থেকে শুরু করে সেই নভঃমন্ডল পর্যন্ত সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার সাথে এক যোগসূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে জগতে কল্যাণ বা মঙ্গল স্থাপন তখনই সম্ভব হবে যখন তা সকল জীবের সমষ্টি কল্যাণের দিকে পরিচালিত হবে।

কল্যাণ তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়?

কল্যাণ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল কল্যাণের প্রকৃতি ও তার স্বরূপ কি সে বিষয়ে জানা কারণ কল্যাণের মাত্রাটি নির্ধারিত হয় জগতে প্রতিটি সত্তার সার্বিকভাবে ভালো থাকা বা সুস্থ থাকার মাত্রা ভেদের মধ্যে দিয়ে। তাই সঠিক অর্থে ভালো থাকা বলতে, সেই সুখস্থিতি কে নির্দেশ করে যা নিজে এবং তার সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে জগতের প্রতিটি জীবের সার্বিক সুখ বা মঙ্গলকে বোঝায়। এখন প্রশ্ন ওঠে এই ভালো থাকা বিষয়টি ঠিক কি রকমের? এটি সুখের সঙ্গে জড়িত নাকি দুঃখ না থাকাকে বোঝায়? কারণ জগতে অবিমিশ্র সুখ বলে কিছু হয় না। জগতে সুখ ও দুঃখ সহচর ভাবে অবস্থান করে। তবে সাধারণ অর্থে সুখ বলতে আমরা যা বুঝি তা দুঃখেরই সাময়িক অনুপস্থিতি। কল্যান বা সুখস্থিতির ধারনাটি একটি জটিল ধারণা, যা শুধুমাত্র সাধারণভাবে দুঃখের সাময়িক অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি জীবের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, জাগতিক সকল বিষয়গুলির মধ্যেস্থিত সমস্ত প্রকার দুঃখ বা যন্ত্রণার পূর্ণ নিবৃত্তিকে বোঝায়। কারণ জগতে দুঃখ নিত্য এবং এজগতে এমন কোন ব্যক্তি নেই যে দুঃখ অনুভব করেনি দুঃখ সর্বদাই আমাদের গ্রাস করে রেখেছে। তাই সঠিক অর্থে সুখ বা শান্তিপূর্ণ কল্যাণময় স্থিতি লাভ করতে হলে দুঃখ হতে চিরনিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন কারণ এজগতে দুঃখই সকল প্রকার ভালো থাকা বা শান্তিতে থাকার পথে একমাত্র অন্তরায়। সেকারনে একমাত্র এই দুঃখ হতে নিবৃত্ত হতে পারলে আমরা এক শাশ্বত আনন্দময় শান্তিপূর্ণ স্থিতি লাভ করতে পারব। যা প্রত্যেকটি জীব ও তার সাথে সাথে সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণে সহায়ক হয়ে উঠবে।

ভারতীয় দর্শন বেদ উপনিষদে কল্যাণের ভূমিকা:

এই শান্তিপূর্ণ স্থিতি লাভ করতে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় দর্শন সর্বদাই উন্মুখ। ভারতীয় দর্শন মোক্ষবাদী দর্শন। মোক্ষ বা মুক্তিই তার চরম বা পরম লক্ষ্য। তবে এই মুক্তি কি? এই মুক্তি দুঃখ হতে মুক্তি, বন্ধন হতে মুক্তি। এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে প্রচুর বর্ণনা মেলে আস্তিক ও নাস্তিক ভেদে প্রায় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই তাদের স্বীয় মতানুসারে এই দুঃখমুক্তির তত্ত্ব বর্ণনা করে গেছে। যা তাদের নির্দেশিত পথে মুক্তিলাভ তথা কল্যাণ সাধনের পথপ্রদর্শক। মুক্তি কি? মুক্তি শব্দটি 'মুচ্' ধাতু হতে নিষ্পন্ন হয়েছে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যয়ী ব্যাকরণে বলেছেন 'মুচ্' ধাতুর অর্থ মোক্ষণ।[১] বেদে আছে মুক্তি বলতে বোঝায় যা মৃত্যুরূপ বন্ধন হতে মুক্ত করে। কঠ্ উপনিষদে বলা হয়েছে মুক্তি হলো মৃত্যু হতে মুক্তি 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'।[২] বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ'[৩] অর্থাৎ সকল প্রকার কামনা হতে মুক্ত হওয়াই

---

[১] 'মুচ্ লূ মোক্ষণে'। পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৭/৩/৫২

[২] 'মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'। কঠ্, উ, ১/৩/১৫

[৩] 'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি শ্রিতাঃ'। বৃহ, উ, ৪/৪/৭

মুক্তির স্বরূপ। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে সকল প্রকার পাশ হতে মুক্তি 'মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'[৪], গীতায়[৫] বলা হয়েছে, সঙ্গ হতে মুক্তি। পাপ হতে মুক্তি। ধর্মাধর্মাদি কর্মের কর্তৃত্ববুদ্ধিরূপ বন্ধন হতে মুক্তি, অশুভ হতে মুক্তি, দ্বন্দ্বমোহ হতে মুক্তি, জন্ম, মৃত্যু, জরামরণ হতে মুক্তি, সুখ ও দুঃখ হতে মুক্তি, হর্ষ, মর্ষ, ভয়, ও উদ্বেগ এই সকল বিষয় হতে মুক্তি। কাম, ক্রোধ, লোভ, হতে মুক্তি, প্রকৃতিজ গুনত্রয় সত্ত্ব, রজো, তমো, হতে বিমুক্তি। ও জন্ম বন্ধনের চক্রাকার আবর্তন হতে সদা মুক্তি, মুক্তি তত্ত্বের বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোচনা বেদ, উপনিষদে ও ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে যেকোনো রূপেই হোক না কেন দুঃখ হতে মুক্তিই যা বন্ধনের মূল কারণ সুতরাং এই দুঃখ হতে মুক্তিই প্রধানরূপে মুক্তির স্বরূপ। তবে সঠিক অর্থে এই মুক্তির স্বাদ আমরা তখনই লাভ করতে পারব যখন আমরা উপলব্ধি করতে পারব ও অনুসন্ধানে ব্রতী হবো এই দুঃখের মূল কারণের। দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারলেই অর্থাৎ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটলে তবেই জাগতিক কল্যাণ সাধিত হবে।

সাংখ্য দর্শনে কল্যাণতত্ত্ব:

এই দুঃখ হতে চিরমুক্তির পথ প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় আস্তিক ষড়দর্শন সম্প্রদায়ের সর্বপ্রাচীন দর্শন সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শন সৃষ্টিই হয়েছে দুঃখমুক্তির উদ্দেশ্যে। কারণ অন্যান্য সকল দর্শনের লক্ষ্য চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সাধনে মোক্ষপ্রাপ্তি হলেও তাদের উপায় ও সাধন পথের যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জটিলতা সেটি একজন সাধারণ জীবের পক্ষে সহজে সাধন করা অতি দুষ্কর তাই এ বিষয়ে সাংখ্য দর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রাপ্তির পথ নির্দেশ করে। যেহেতু বিনা প্রয়োজনে কোন জীব কোন কাজেই প্রবৃত্ত হয় না তাই প্রতিটি জীবই নিজ জীবনে দুঃখ যন্ত্রণায় সদা ক্লিষ্ট বলে সে তার এই দুঃখ যন্ত্রণা হতে চিরমুক্তির প্রয়োজনের স্বাভাবিক তাগিদেই এমন প্রতিকারেরই আশা করবে যা তাকে সেই দুঃখ হতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে সাহায্য করবে। দুঃখ মুক্তি ও কল্যাণ সাধনের পরম প্রতিকারটি হল সাংখ্য শাস্ত্র। এবিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ 'সাংখ্যকারিকা'র ৭০ নং কারিকায় বর্ননা করেছেন।

> "এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
> আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কতৃম তন্ত্রম"।।[৬]

সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিল দুঃখ তাপে জর্জরিত জীবকুলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে জীবের ঐকান্তিক কল্যাণ সাধনে উন্মুখ হয়ে এই পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান যা সাংখ্যশাস্ত্র তাঁর শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেছিলেন এরপর আসুরি তাঁর শিষ্য পঞ্চশীখকে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এরপর শিষ্য পরম্পরায় এই সাংখ্যতত্ত্বজ্ঞান জগতে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হিসেবে বহুভাবে বহু শিষ্য মধ্যে প্রচারিত হয় ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে।

ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দর্শনকে সর্বপ্রাচীনতম দর্শন বলে গণ্য করা হয়। আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে বেদ, উপনিষদ, ছান্দোগ্য, প্রশ্ন, কঠ্ ও বিশেষ করে শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে সাংখ্যের বর্ণনা মেলে। এছাড়াও মহাভারত, ভগবতগীতা, স্মৃতি ও পুরাণে সাংখ্য মতের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে 'সাংখ্য' নামটিকে কেন্দ্র করে দার্শনিক মহলে প্রচুর মতভেদ আছে । অনেকে 'সাংখ্য' শব্দটি কে 'সংখ্যা' শব্দের থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। অনেকে সংখ্যা, পরিসংখ্যান

---

[৪] 'মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ'। শ্বেতা, উ, ১/৮, ২/২৫, ৪/১৬, ৫/১৩, ৬/১৩

[৫] শ্রীমদ্ভগবতগীতা।

[৬] "এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া" ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ৭০।

ও গণনার অর্থে গ্রহণ করেন যেহেতু সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের ধারণা মেলে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে 'সাংখ্য' শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্যক জ্ঞান অর্থেই গৃহীত হয়েছে 'সং' শব্দের অর্থ সম্যক ও 'খ্যা' শব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনের প্রধান দুটি তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষের বিভেদ জ্ঞানই সম্যক জ্ঞান। অতি প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায় হওয়ার কারণে ও কালের স্রোতে সাংখ্য দর্শনের বহু প্রামাণ্য ও প্রাচীন গ্রন্থগুলি লুপ্তপ্রায় ও অজানা তবে বর্তমান কালে যে সকল গ্রন্থগুলি সাংখ্য দর্শনের প্রামাণ্যগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে গৃহীত হয়। 'সাংখ্যকারিকার' ৭০ টি কারিকার মধ্যে প্রথম কারিকাটি ঈশ্বরকৃষ্ণ শুরুই করেছেন "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ" শব্দের দ্বারা।

প্রথম কারিকা–

> "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।
> দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ"।।[৭]

ত্রিবিধ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) দুঃখের অভিঘাতের ফলে অর্থাৎ আঘাতের ফলে সেই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তির হেতু সাংখ্য শাস্ত্রীয় উপায় বিষয়ে জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় না। এই প্রথম কারিকায় যে দুঃখ ত্রিবিধ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এই ত্রিবিধ মানে তিনটি দুঃখ নয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ যা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তিন প্রকারের বলে সাংখ্যকারিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। যা জীবের সকল প্রকার ভালো থাকার বিষয়কে ত্বরান্বিত করে। সাংখ্যকারিকার ভাষ্য "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী" তে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, "দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং"[৮] সকল দুঃখ সমূহ কে ত্রিবিধ দুঃখ রূপে বর্ণনা করা হয় এই ত্রিবিধ দুঃখ হলো আধ্যাত্মিক,আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখ।

আধ্যাত্মিক দুঃখ: আধ্যাত্মিক শব্দের অন্তর্গত 'আত্মা' শব্দের দ্বারা এখানে শরীর ও মনকে বোঝানো হয়েছে। আন্তর থেকে যে দুঃখ আসে তার শারীর ও মানস ভেদে দুই প্রকার। বাত, পিত্ত ও কফের তারতম্যের ফলে শরীরে ব্যাধির সঞ্চার হয়। যার ফলে শারীর দুঃখ ঘটে। অপরদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিষাদ, প্রিয় বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগের ফলে মানসিক দুঃখ যা মানুষের জীবনে ভালো থাকার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

আধিভৌতিক দুঃখ: আধিভৌতিক শব্দের অন্তর্গত 'ভূত' শব্দের অর্থ স্থাবর ও জঙ্গম।স্থাবর অর্থে বৃক্ষপর্বতাদিকে এবং জঙ্গম অর্থে মানুষ, পশু ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে, বাহ্যিক কারণ দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ হলো, আধিভৌতিক দুঃখ। মানুষ, পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ, কন্টক প্রস্তরাদি দ্বারা উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ।

আধিদৈবিক দুঃখ: আধিদৈবিক দুঃখের মধ্যে 'দৈব' শব্দের দ্বারা দেবযোনিকে বোঝানো হয়েছে। বিদ্যাধর, বিনায়ক, অপ্সরা, গন্ধর্ভ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও ভূত-প্রেত কে বলা হয় দেবযোনি। এই অপদেবতাদের দ্বারা সৃষ্ট অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, বন্যা, মহামারী এইসব দৈব দুর্বিপাকের ফলে যে বাহ্যিক কারণে যে দুঃখের জন্ম হয় তা আধিদৈবিক দুঃখ নামে পরিচিত।

এই ত্রিবিধ দুঃখ তাপে তাপিত জীব দুঃখের অভিঘাতের ফলে সর্বদাই ব্যথিত থাকে ফলে সে নিজে কখনো সুখে থাকতে পারে না যার ফলে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সুখস্থিতিকেও নষ্ট করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই সে এই নিদারুণ দুঃখ হতে মুক্তির পথ অন্বেষণের চেষ্টা করে। দুঃখ কী? এবং দুঃখ নিবৃত্তি কী উপায়ে সম্ভব সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় দুঃখের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু নির্দেশ না করলেও

---

[৭] "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"– ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং– ১।

[৮] "দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং"– বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে বাচস্পতি মিশ্র দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে বলেছেন, "দুঃখং রজঃ পরিনামভেদো"[৯] অর্থাৎ দুঃখ হলো রজোগুণের পরিণাম। দুঃখ রজোগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ নিত্য। নিত্য বস্তুর নাশ হওয়া সম্ভব নয়। দুঃখ নিত্য হওয়ার তার নাশ সম্ভব নয়। জগতে প্রত্যেকটি জীব দুঃখ অনুভব করে জগতে কোন ব্যক্তিই দুঃখকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সেকারনে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি বলেন, "তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং দুঃখং রজঃপরিনামভেদো ন শক্যতে প্রত্যাখ্যাতুম্"[১০] তাহলে এই ত্রিবিধ দুঃখ তাপে তাপিত জীব দুঃখমুক্তির নিবৃত্তি হেতু জিজ্ঞাসা করে যে দুঃখের কি আদৌ নিবৃত্তি সম্ভব নয়? যদি সম্ভব হয় তা কিভাবে সম্ভব? কারণ দুঃখের নিবৃত্তি এমন হওয়া প্রয়োজন যা চিরকালীন, ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক যার আর পুনরাগমন হবে না। তাই বাহ্যিক উপায় দ্বারা এরূপ দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয় কারণ এগুলির সাময়িকভাবে দুঃখ-নিবারণের সহায়ক হলেও দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে সহায়ক নয়। সে বিষয়ে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বলা হয়েছে, "যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং, তথাপি তদভিভবঃ..."[১১] অর্থাৎ যদিও সৎ বস্তু দুঃখের নিরোধ করা যায় না কিন্তু দুঃখের অভিভব সম্ভব। যার দ্বারা দুঃখরূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুন পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থায় অভিভূত হয়। এই রজোগুণের অভিভূত হওয়ার ফলে দুঃখের নাশ না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। এই অভিভবের প্রক্রিয়া কি রূপে সম্ভব তার সম্যক উত্তর লাভ করতে হলে সাংখ্য দর্শন তত্ত্বের ব্যক্ত ,অব্যক্ত ও জ্ঞয়ের জ্ঞান যা বিবেকজ্ঞান নামে পরিচিত সেই জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। যা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর 'সাংখ্যকারিকার' দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণনা করেছেন, "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"[১২]। 'ব্যক্ত' বলতে প্রকৃতির পরিণাম ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। 'অব্যক্ত' বলতে প্রকৃতি বা প্রধানের কথা বলা হয়েছে। এবং 'জ্ঞ' বলতে পুরুষ চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে। তাই সাংখ্যকারিকার দ্বিতীয় কারিকায় বলা হয়েছে,

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।।"[১৩]

দ্বিতীয় কারিকায় বলা হয়েছে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ও লৌকিক বা দৃষ্ট উপায়ের মত যা দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধনে অসমর্থ। যার ফলে জগতে কল্যান স্থাপনও সম্ভব হবে না। এই বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপগুলি যেহেতু অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয়যুক্ত। সেকারনে এইগুলির বিপরীতে দুঃখ নিবৃত্তির সেই সাংখ্যশাস্ত্রীয় উপায় ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানই শ্রেয়। কারণ একমাত্র এই বিবেকজ্ঞান থেকে দুঃখের অবশ্যম্ভাবী চির নিবৃত্তি সম্ভব হয় এবং একমাত্র এই বিবেকজ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ রূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থায় রজোগুনে অভিভূত হয় যার ফলে দুঃখমুক্তি সম্ভব হবে।

সাংখ্য দর্শন নির্দেশিত পথ অবলম্বনে দুঃখ মুক্তি ঘটলে জগতে পরম কল্যাণ স্থাপন হয়। এই দুঃখ মুক্তির জন্য দরকার সাংখ্যা নির্দেশিত "বিবেকজ্ঞান"। সাংখ্য দর্শনে দু প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জগৎ অভিব্যক্তির সৃষ্টি হয় তখন প্রকৃতির মধ্যস্থিত সত্ত্ব, রজো ও তমো গুনের সাম্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। এই বিঘ্নের ফলে প্রকৃতি হতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হল- ১) মহৎ বা বুদ্ধি, ২) অহঙ্কার, ৩) মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে ৪) চক্ষু, ৫) কর্ণ, ৬) নাসিকা, ৭) জিহবা, ৮) ত্বক,

---

৯ "দুঃখং রজঃ পরিনামভেদো"- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১০ "তদেতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং"– বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১১ "যদ্যপি ন সন্নিরুধ্যতে দুঃখং, তথাপি তদভিভবঃ"- বাচস্পতি মিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী।

১২ "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ"- ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা। কারিকা নং-২।

১৩ "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ"– ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ২।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে ৯) বাক্, ১০) পাণি, ১১) পাদ, ১২) পায়ু, ১৩) উপস্থ। পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে ১৪) শব্দ, ১৫) স্পর্শ, ১৬) রূপ, ১৭) রস, ১৮) গন্ধ, পঞ্চমহাভূতের মধ্যে ১৯) আকাশ, ২০) মরুৎ, ২১) তেজ, ২২) অপ্, ২৩) ক্ষিতি। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো কোনো তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি, আবার কিছু তত্ত্ব শুধু বিকৃতি বা বিকার। এবিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকার তৃতীয় কারিকায় বলেছেন,

> "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
> ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ।।"[১৪]

মূলপ্রকৃতি কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়। মহৎ আদিতে যাদের এমন সাতটি তত্ত্ব (যথা- মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র কোন তত্ত্বের) কারণ এবং (অন্য কোন তত্ত্বের) কার্য এগুলি প্রকৃতি-বিকৃতি নামে পরিচিত। ষোলটি তত্ত্ব (যেমন- মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত,) এগুলি শুধুমাত্র কোন না কোন তত্ত্বের কেবলমাত্র কার্য এগুলি কেবল বিকৃতি নামে পরিচিত। পুরুষ (কোন তত্ত্বের) কারণও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্যও নয়। এই বিষয়গুলির জ্ঞানলাভ প্রয়োজন।

সাংখ্য মতে জ্ঞ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, বিকারবিহীন, পরিবর্তনবিহীন, উদাসীন সাক্ষীমাত্র। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতে পুরুষের বা আত্মার প্রতিবিম্বনের ফলে পুরুষ বা আত্মাতে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বভাবের উদয় হয়। প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধির সান্নিধ্যে পুরুষ নিজেকে জ্ঞাতা,কর্তা ও ভোক্তা বলে মনে করে। এই সকলই বৃত্তিজ্ঞান। বিবেকজ্ঞানের অভাববশত চৈতন্যপুরুষ অচৈতন্য প্রকৃতির পরিনাম বুদ্ধির বিকার কে নিজের বিকার বলে মনে করে। যার ফলে অচৈতন্য প্রকৃতির পরিণাম চিত্তের বিকারকে চৈতন্য আত্মা নিজের বিকার বলে মনে করাই জাগতিক দুঃখের একমাত্র মূল কারণ। যার ফলে বন্ধন দশার সৃষ্টি হয়। একমাত্র বিবেক জ্ঞানের উদয় হলে অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ ছিন্ন হলে প্রকৃতি স্থিত গুণগুলি সাম্যবস্থায় আসে এবং প্রকৃতি তার নিজ স্বরূপে বিরাজমান হয়। তখন আত্মা বা পুরুষ তাঁর স্বরূপ শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থান করে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলে দুঃখের নিরোধ বা অভিভব হয় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় স্থুল রূপে অভিব্যক্ত দুঃখকে সূক্ষ্ম রূপ প্রাপ্ত করানো যায় এবং দুঃখ চিরতরে সূক্ষ্ম রূপে পর্যবসিত হলে অর্থাৎ দুঃখের কারণ নিত্য রজোগুন যা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে জগৎ অভিব্যক্তির কালে স্থূল অবস্থায় থেকে প্রকৃতির পরিণাম জাগতিক সকল বস্তুতে দুঃখের সঞ্চার ঘটায়। প্রকৃতি পুরুষের বিভেদ জ্ঞান জন্মালে সেই স্থুল রজোগুণ সূক্ষ্ম রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় যার ফলে দুঃখত্রয়ের অবসান ঘটে। এবং এই দুঃখত্রয়ের আর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। যার ফলে দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়।

উপসংহার:

সার্বিক কল্যাণ সাধনই সাংখ্য দর্শনের মূল লক্ষ্য। সাংখ্য দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ দুটি জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। সাংখ্য সম্মত বিবেকজ্ঞান লাভ হলে জীবের প্রারব্ধ কর্মের ভোগের কাল সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সে ভোগবাসনাশূন্য হয়ে সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন জীবন্মুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এই প্রারব্ধ কর্মের ভোগ বিবেকজ্ঞান লাভের ফলে অতি দ্রুত বিনষ্ট হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির দ্বারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি বিদেহ মুক্তি লাভ করে চতুবর্গ পুরুষার্থের পরম পুরুষার্থ মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। উক্ত প্রক্রিয়ায় জীবের কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ও দুঃখের চিরকালের অবসান ঘটে জগতে কল্যাণ স্থাপিত হয়। তাই এই সাংখ্য নির্দেশিত বিবেকজ্ঞান লাভ করলে চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ নিত্য কল্যাণময় অবস্থায় সর্বদা বিরাজমান থাকতে পারবে। তখন দুঃখ বলে

[১৪] "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ" - ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, কারিকা নং- ৩।

কিছু থাকবে না এবং ব্যক্তিমাত্রই সেই কাঙ্খিত অনন্ত দুঃখাতীত শুদ্ধ চিত্তের স্থিতিতে অবস্থান করবে যা হবে প্রকৃতপক্ষে পরম কল্যাণের চূড়ান্ত অবস্থা। তাই জগতে পরম কল্যাণ স্থাপনের জন্য সাংখ্য নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ: পাণিনি।

২. কঠ্ উপনিষদ।

৩. বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

৪. সাংখ্যকারিকা। ঈশ্বরকৃষ্ণ।

৫. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। বাচস্পতি মিশ্র।

৬. যুক্তি দীপিকা। লেখক অজ্ঞাতসার।

৭. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৬১।

৮. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃতা সাংখ্যকারিকা শ্রীমদবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, বৈশাখ- ১৪১৮।

৯. দিবাকরানন্দ, স্বামী (অনুদিত)। শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা। (সটীক বঙ্গানুবাদ), প্রকাশক, গনেশচন্দ্র দত্ত, ৩৪ সদানন্দ রোড, কলকাতা, ১৯৭৬।

১০. ভট্টাচার্য্য, শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ। সাংখ্যদর্শন। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা।

১১. ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ। সাংখ্যদর্শনের বিবরণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৮।

১২. বেদান্তচুঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র। সাংখ্যকারিকা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০০৭।

১৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার। সাংখ্যকারিকা (গৌড়পাদভাষ্য- তত্ত্বকৌমুদীসহিতা সানুবাদ)। সদেশ, কলকাতা।

১৪. ভট্টাচার্য, রজত। সাংখ্যকারিকা (সম্পূর্ণ): সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (প্রথম খন্ড)। প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০১১।

১৫. Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philosophy.* Delhi, Motilal Banarsidas Publishers, 2014.